দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা: রাষ্ট্রহীনতার ইতিবৃত্ত থেকে একখণ্ড সোনার বাংলা

মোঃ মামুন অর রশিদ

কোনো রাষ্ট্র নয়, ছিটে বসবাস করে! ভোটের অধিকার নেই, নিরাপত্তা নেই, পরিসংখ্যানেও নেই, ঘর থেকে বেরিয়ে স্বাধীনভাবে পা ফেলার জায়গা নেই, চারদিকে ভারতের দুস্তর ভূখণ্ড। কয়েক বছর আগেও ছিটের মানুষ এভাবেই নিজভূমে পরবাসী হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করত। জল ও স্থল বেষ্টিত এরকম একটি ছিটমহল ছিল দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা। বর্তমানে এই ভূখণ্ডের মানুষ রাষ্ট্রহীনতার ইতিবৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে মৌলিক অধিকার পেতে শুরু করেছে। দহগ্রাম-আঙ্গারপোতায় উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। উন্নয়নের গল্পের আগে পিছন ফিরে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতার রাষ্ট্রহীনতার ইতিবৃত্ত দেখে নেয়া যাক।

১৯৪৭-৭১ সময়ে ভারত ও পাকিস্তান ছিটমহল সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। ফলে ছিটমহল সমস্যার দায়ভার এসে পড়ে স্বাধীন বাংলাদেশের ওপর। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে ভারত-পাকিস্তান ছিটমহলগুলো বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহলে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে স্বাক্ষরিত 'মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি'র ১২ ও ১৪ নম্বর সেকশনে ছিটমহল ইস্যুটি সমাধানের কথা বলা হয়।

বাংলাদেশের লালমনিরহাটের পাটগ্রাম থানার পানবাড়ী থেকে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতার মাঝে মাত্র ১৭৮ মিটার ভারতীয় ভূখণ্ডের কারণে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতাবাসী আজীবন বন্দি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ৪৫ বছর ধরে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতার মানুষকে নিত্য প্রয়োজনে এই ১৭৮ মিটার দুস্তর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে রাতের অন্ধকারে, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গ্রেপ্তার, লাঠিচার্জসহ নানা হয়রানি সহ্য করে। ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তিতে বেরুবাড়ীর বিনিময়ে ভারতের তিনবিঘা নামক স্থানে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতার সঙ্গে ভারতের মাত্র ১৭৮ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ৮৫ মিটার প্রস্থের একটি করিডোর (তিনবিঘা করিডোর) বাংলাদেশকে চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দেওয়ার কথা থাকলেও ভারত সরকার ১৯৭৪ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ বছর এ নিয়ে টালবাহানা করে। বাংলাদেশের অনবরত দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৮২ ও ১৯৯২ সালে নতুন করে আরও দুটি চুক্তির পর অবশেষে ১৯৯২ সালে সেই করিডোর দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতার মানুষ খুব সীমিত পরিসরে চলাচলের সুযোগ পায়। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হলেও দহগ্রাম-আঙ্গারপোতার মানুষকে শর্ত সাপেক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশে বৈধভাবে প্রবেশের জন্য দীর্ঘ ২১ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। দুই পাশে সশস্ত্র বিএসএফের সার্বক্ষণিক পাহারায় ১৯৯২ সালের ২৬ জুন প্রথমে প্রতি দুই ঘণ্টা পর পর এক ঘণ্টা করে দিনে মোট তিন ঘণ্টার জন্য তিনবিঘা করিডোর বাংলাদেশের নাগরিকদের যাতায়াতের জন্য খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এর তিন মাস পর থেকে সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত প্রতি এক ঘণ্টা পর পর এক ঘণ্টা করে মোট ছয় ঘণ্টা খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয় এবং এই ব্যবস্থা চলতে থাকে ২০০১ সাল পর্যন্ত। ২০০১ সালে নতুন ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে করিডোরটি সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে ১২ ঘণ্টা খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। বাকি ১২ ঘণ্টার জন্য দহগ্রাম আঙ্গারপোতার পুরো জনপদটি ছিল একটি কারাগার! অবশেষে ২০১১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যকার চুক্তি অনুযায়ী করিডোরটি ২৪ ঘণ্টার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ২০১১ সালের ১৯ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে করিডোরটি ২৪ ঘণ্টার জন্য উন্মুক্ত ঘোষণা করেন।

১৯৪৭ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে কত মানুষ যে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছে তার হিসেব নেই। মৃত্যুর পর অনেকের ভাগ্যে দাফনের কাপড় পর্যন্ত জোটেনি। ১৯৯২ থেকে ২০১১ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৯ বছরে করিডোর বন্ধ- খোলার দোলাচলে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতার মানুষের দুঃখ ও দুর্দশা আবর্তিত হয়েছে।

এখনো দহগ্রাম-আঙ্গারপোতার মানুষ পূর্বের বঞ্চনার কথা স্মৃতিচারণ করলে তাঁদের চোখ দিয়ে পানি ঝরে। বর্তমানে এই ভূখণ্ডে পুরোদমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে এখানে ২০ শয্যার একটি হাসপাতালসহ ৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কয়েক বছর আগেও যে ভূখণ্ডে কেউ অসুস্থ হলে দোয়া ও সেবা করা ছাড়া চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, বর্তমানে হাতের কাছে চিকিৎসাসেবা পেয়ে এখানকার মানুষ খুবই খুশি।

শিক্ষা ক্ষেত্রেও এগিয়ে যাচ্ছে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা। সরকার ২০১৩ সালের ৬ অক্টোবর দহগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে। পরবর্তীতে দহগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়কে কলেজিয়েট করা হয়েছে। দহগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্তমানে একটি ছয়তলা একাডেমিক ভবনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও এখানে রয়েছে ৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১টি এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা। যে ভূখণ্ডে একসময় সাক্ষরজ্ঞান অর্জন করাও দুরূহ ছিল, সেখানে এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছে, ছাত্র

ছাত্রীরা পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। এ ভূখন্ডের ছেলেমেয়েরা এখন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করছেন।

২০১১ সালের ১৯ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দহগ্রাম-আঙ্গারপোতায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। দহগ্রাম-আঙ্গারপোতার মানুষ বিদ্যুৎ পেয়ে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য এখানে একটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতার কারণে এখানকার মানুষ শান্তিতে আছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এখানে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। দহগ্রাম-আঙ্গারপোতার অধিকাংশ রাস্তা পাকা করা হয়েছে। বাকি রাস্তাও পাকাকরণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও এখানে বেশ কয়েকটি ব্রিজ এবং কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় দহগ্রাম ইউনিয়নে ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এখানে ১৩০টি ঘর নিয়ে গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর ফলে গৃহহীন মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে।

দহগ্রাম-আঙ্গারপোতায় এ পর্যন্ত অনেক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু দহগ্রাম-আঙ্গারপোতার প্রধান সমস্যা হলো নদী ভাঙন। ২২.৬৮ বর্গ কিলোমিটারের এই ভূখন্ড প্রতিনিয়ত তিস্তা নদীর ভাঙনে সংকুচিত হচ্ছে। 'সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (২য় পর্যায়)' প্রকল্পের আওতায় দহগ্রামে নদী ভাঙন প্রতিরোধে বাঁধ নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। বাঁধ নির্মাণের কাজ ২০২০ সালের জুনের মধ্যে শেষ করার কথা থাকলেও তা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। অতি দ্রুত বাঁধ নির্মাণ করে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতাকে নদী ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। দ্রুত বাঁধ নির্মাণ করা না হলে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এখানকার আরেকটি সমস্যা হচ্ছে স্থানীয় জনগণ তাঁদের গরু বিক্রি করতে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে বিএসএফ খুবই সীমিত সংখ্যক গরু করিডোর পার করার সুযোগ দেয়। কোনো গরু তিন বিঘা করিডোর পার করতে জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্টদের প্রত্যয়ন প্রয়োজন। এর ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে গৃহপালিত গরু জরিপ ও নিবন্ধন করা খুবই প্রয়োজন। নিয়মিত গরু জরিপ ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালু থাকলে স্থানীয় জনগণের গরু বিক্রির ভোগান্তি লাঘব হবে। একইসঙ্গে নিবন্ধিত গরু করিডোর পার করার ক্ষেত্রে সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।

দহগ্রাম-আঙ্গারপোতায় সরকারের ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে এ ভূখন্ডের মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পেতে শুরু করেছে। দহগ্রাম-আঙ্গারপোতায় সরকারের এই উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যাহত থাকলে এ জনপদের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটবে। এ ভূখন্ডটিকে একটি পর্যটন কেন্দ্রহিসেবে গড়ে তোলা হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দহগ্রাম-আঙ্গারপোতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং রাষ্ট্রহীনতার ইতিবৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা এ জনপদটি একখন্ড সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

ছিটমহল সমস্যার সমাধান জাতীয় স্বার্থে দিক থেকে কোন স্পর্শকাতর বিষয় ছিল না। ছিটমহল বিনিময় মাধ্যমে কোন দেশেরই ক্ষতি বা হারানো কিছু নেই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠা ভারতীয় সরকার ও জনগণ এবং বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় ও সমঝোতা কালক্রমে আমলাতান্ত্রিকতার বেড়াজালে আটকে যাচ্ছিল, পথ হারাচ্ছিল অবহেলা আর সন্দেহের চোরাগলিতে। কিন্তু সেখান থেকে তেরঙ্গা-লাল সবুজ সম্পর্ককে এক অনিন্দ্য সুন্দর জায়গায় নিয়ে গিয়েছে এই সীমান্ত চুক্তি। আমাদের প্রত্যাশা সকল দ্বি-পক্ষীয় সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে 'গণভবন' থেকে 'জনপথ' রোড এর দূরত্ব কমে আসবে, ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক হয়ে উঠবে আরো চিরঞ্জীব ও শ্বাশত।

#

লেখক: তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, লালমনিরহাট

০৬/১২/২০২১ পিআইডি ফিচার